বর্ষে বর্ষে বাড়ছে দেনা

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী

বর্ষে বর্ষে ঋণ বাড়বে, এটাই নিয়ম। কিন্তু একটা বিশেষ দেনা আছে আমাদের যার খবর রাখা হয় না, রাখা যায় না, রাখাটা কঠিন বটে। সে-ঋণ আর কারো কাছে নয়, আমাদের নিজেদের কাছে, বর্তমানের কাছে তো বটেই, ভবিষ্যতের কাছেও, এমনকি অতীতের কাছেও বলা যাবে। সেটা হচ্ছে ইতিহাসের কাছে দায়বদ্ধতা। আমরা কি ইতিহাসকে যুক্ত করবো, তার যাত্রাপথে, নাকি আটকে রাখবো এখন সে যেখানে আছে? আটকে রাখা মানে তো আরো নেমে যাওয়া। কেননা, স্থিতাবস্থা বলে তো স্থায়ী কোনো অবস্থান নেই, দীর্ঘকাল স্থায়ী হওয়া মানে নিচে নেমে যাওয়া। নামতে থাকা।

নির্দিষ্ট করে বলা যাবে, সমাজে আমরা মৌলিক পরিবর্তন চাই। সেই পরিবর্তনের মূল রেখা আঁকা এখানে প্রাসঙ্গিক নয়, প্রাসঙ্গিক হচ্ছে তার মূল কাঠামোটাকে চিহ্নিত করা। সন্দেহ কী যে কাঠামো হবে গণতান্ত্রিক। আর গণতন্ত্রের মূলনীতি হচ্ছে নাগরিকদের মধ্যে অধিকার ও সুযোগের সাম্য। বর্তমানে যা মোটেই নেই। এবং নেই বলেই সমাজ আটকে পড়ে রয়েছে একটি বৃত্তে। যে-বৃত্ত দুঃসহ, যার মধ্যে বন্দী অবস্থায় আমরা দেখছি আমাদের চারপাশের সমাজ ক্রমাগত মনুষ্য বসবাসের অনুপযুক্ত হয়ে পড়ছে।

এই সমাজকে বদলানো যাবে না রাষ্ট্রকে না-বদলে নিলে। রাষ্ট্রের চেয়ে সমাজ প্রাচীন বটে, শক্তিশালী ও বিস্তৃতও বটে। কিন্তু সমাজ প্রত্যক্ষ-অপ্রত্যক্ষভাবে নিয়ন্ত্রিত হয় রাষ্ট্রের দ্বারা। এবং সত্য হলো এই যে, বাংলাদেশে রাষ্ট্রের চেহারায় বদল হয়েছে ঠিকই, কিন্তু চরিত্রের বদল হয়নি। ব্রিটিশ শাসনে এই রাষ্ট্র একটা মস্ত বড় রাষ্ট্রের অংশ ছিল, পাকিস্তান আমলে বড় রাষ্ট্র ছোট হলো, বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে সে-রাষ্ট্র আরো ছোট হয়েছে, রাষ্ট্রের আয়তন বদলেছে, নাম বদলেছে, শাসকও এক নেই, কিন্তু তার চরিত্র সেই ব্রিটিশ শাসনকালে যা ছিল আজকের স্বাধীন বাংলাদেশেও সেটাই রয়ে গেছে। এই রাষ্ট্র পীড়নকারী। ব্রিটিশের কালে এর সাংগঠনিক কাঠামোটি ছিল আমলাতান্ত্রিক, পকিস্তান আমলেও সে-রকমই ছিল, এখনো তা-ই রয়ে গেছে। রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা ও আদর্শ ব্রিটিশের কালে ছিল পুঁজিবাদী, পাকিস্তানের কালে সেটা বদলায়নি, বাংলাদেশেও রাষ্ট্রের অর্থনীতি ও আদর্শ পুঁজিবাদীই বটে। অর্থাৎ আমলাতান্ত্রিক পুঁজিবাদী রাষ্ট্র শোষণভিত্তিক অন্যায় সমাজব্যবস্থাকে টিকিয়ে রেখেছে, প্রতিহত করছে সামাজিক বিপ্লবের সম্ভাবনাকে।

কথা ছিল বাংলাদেশে আমরা একটি বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র পাবো, যা প্রকৃত গণতন্ত্রের অভিমুখে অর্থাৎ সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি ও আদর্শ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যের দিকে এগুবে। রাষ্ট্র সেদিকে এগোয়নি। সমাজতন্ত্র এখন সংবিধানে নেই। এবং বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পর একটির পর একটি সরকার এসেছে ও চলে গেছে; কিন্তু সরকারকেই গণতান্ত্রিক বলবার উপায় নেই। কারো মধ্যেই জবাবদিহিতার দায় ছিল না, সকলেই ছিল স্বৈরাচারী, জনগণকে লালন-পালন করেনি, তাদেরকে পীড়ন করেছে। জননিরাপত্তা ও বিশেষ ক্ষমতা আইন ব্রিটিশ আমলে ছিল, পাকিস্তান আমলেও ছিল, এখনো আছে। বাংলাদেশ হবার পর সংসদীয় ব্যবস্থা চালু হয়েছিল, কিন্তু টেকেনি; বদলে গিয়ে প্রথমে এসেছে রাষ্ট্রপতি শাসন ব্যবস্থা, পরে এলো বাকশাল, তারপরে সামরিক শাসন, আবারো সামরিক শাসন। এর পরে নির্বাচিত সরকার এসেছে, একটি গেছে, আরেকটি পাওয়া গেছে, কিন্তু তারাও আগের সরকারগুলোর মতোই স্বৈরাচারী। বললে অন্যায় হবে না যে, অবৈধ স্বৈরাচারের বদলে আমরা বৈধ স্বৈরাচার পেয়েছি। অবৈধ স্বৈরাচারের মধ্যে তবু একটা অপরাধবোধ থাকে, বৈধ স্বৈরাচারের ভেতর যা থাকে না; সে আরো বেশি দাম্ভিক হয়।

রাষ্ট্র এখন একটি ফ্যাসিবাদী চরিত্র গ্রহণ করেছে। যার লক্ষণগুলো বড়ই স্পষ্ট। এই রাষ্ট্রে মানবিক অধিকারগুলো প্রতিষ্ঠা পায়নি; অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা ও শিক্ষার অধিকার এখানে নিশ্চিত নয়। নাগরিক অধিকার অনেক ক্ষেত্রেই অস্তিত্বহীন। যেমন ধরা যাক, নারীর চলাফেরার অধিকার। সেটা নেই। মেয়েরা ধর্ষিত হয়। এবং ধর্ষণের ব্যাপারে পুলিশ তো বটেই, এমনকি সেনাবাহিনীর সদস্যরা পর্যন্ত অভিযুক্ত হয়েছে। পুলিশকে লোকে সবসময়েই ভয় করতো, কিন্তু এখন এই স্বাধীন দেশে যতটা ভয় করে, পরাধীনতার কালেও ততটা করেনি। পুলিশের ভাবমূর্তি এখন কেবল দুর্নীতিপরায়ণতার নয়, নিপীড়নকারীরও। এ রাষ্ট্রে বিচারালয়ে গেলে সুবিচার পাওয়া যাবে

এমন নিশ্চয়তা নেই, বরঞ্চ নিঃস্ব হবারই আশঙ্কা। সর্বোচ্চ আদালতের বিচারকদের বিরুদ্ধেও দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে। ফ্যাসিবাদ পুঁজিবাদেরই একটি অসহিষ্ণু রূপ, আমরা সে রূপটিকেই প্রতিনিয়ত দেখতে পাচ্ছি। বিকৃত পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় যেমনটা ঘটবার কথা তেমনটা ঘটা অব্যাহত রয়েছে। বিচার, শিক্ষা, চিকিৎসা সব কিছুই পণ্যে পরিণত হচ্ছে। ব্যক্তি বিচ্ছিন্ন হচ্ছে ব্যক্তি থেকে। ধনী আরো ধনী হতে পারছে, যেমন গরিবের পক্ষে আরো গরিব হওয়া ছাড়া উপায় থাকছে না।

> ইতিহাসের কাছে আমাদের ঋণ দিনে দিনে বর্ষে বর্ষে বাড়ছে। এই ব্যবস্থাকে মেনে নেয়া মানে এর কাছে আত্মসমর্পণ করা। নত হয়ে থাকা। নত হয়ে থাকার অর্থ হলো অবস্থাকে আরো খারাপ হতে দেয়া

এই রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাকে রক্ষা করছে কারা? রক্ষা করছে আমলাতন্ত্র, করছে বড় ব্যবসায়ীরা, এবং করছে বড় দুটি রাজনৈতিক দল ও তাদের সাঙ্গপাঙ্গরা। এরা সকলে মিলে গঠন করেছে বাংলাদেশের শাসক শ্রেণী। রাষ্ট্র এই শাসক শ্রেণীর স্বার্থ দেখে, রাষ্ট্রকে এরা নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করে, এবং নিজেদের বিত্ত ও ক্ষমতা বৃদ্ধিকে অব্যাহত রাখে। এতে স্পষ্টই টের পাওয়া যায় যে, জনগণের সঙ্গে শাসক শ্রেণীর সম্পর্ক মিত্রের নয়, শত্রুর বটে। এই সম্পর্ক পুরাতন এবং চির নতুন।

মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার সময় প্রতিবছরই যে ঘটনা ব্যাপক হারে ঘটে তা হলো পরীক্ষার হলে নকল। এই নকলের জন্য বাংলাদেশ ইতিমধ্যেই বিশ্বখ্যাতি অর্জন করেছে। এ বছর শিক্ষকদের একটি সমিতি সভা করে আবেদন জানিয়েছে যে, পরীক্ষার সময়ে ও তার কিছুটা আগে থেকে ছাত্র সংসদের কার্যক্রম স্থগিত করা হোক, কেননা সেটা করা হলে নকল প্রতিরোধ কিছুটা সহজ হবে। শিক্ষকেরা অভিজ্ঞ, অভিজ্ঞতা থেকেই তাঁরা কথাটা বলেছেন। কোন দলের লেজুড় ছাত্র সংগঠনটি ছাত্র সংসদ দখল করেছে প্রশ্ন সেটা নয়, সত্য হলো এই যে, যে-সংগঠনই দখল করুক, কাজ অভিন্ন। শিক্ষাঙ্গনে ছাত্র সংসদ যা করছে, বৃহত্তর অঙ্গনে জাতীয় সংসদের সদস্যরা কি তা থেকে ভিন্ন কিছু করছেন? বড় দলের রাজনীতিকেরা? কাজ ঐ একটাই, লুণ্ঠন করা। ছাত্র সংগঠন চাঁদা তোলে, নকলবাজিতে সাহায্য করে মুনাফা খায় রাজনৈতিক সংগঠন আরো বড় আকারে ঐ একই কাজে লিপ্ত থাকে। বাংলাদেশে এখন যুদ্ধপ্রভুদের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। যুদ্ধপ্রভুরা নিজ নিজ এলাকার সমাজ, অর্থনীতি, বিচার-আচার প্রশাসন সবকিছুর ওপর ব্যক্তিগত নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে রেখেছেন। এই যুদ্ধপ্রভুরা সংসদ সদস্য, জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি। যারা ভালো তারা ক্ষমতাহীন এবং নিষ্প্রভ, তারা যে দৃষ্টান্ত হবেন সে-উপায় নেই।

বড় দলের ছাত্র সংগঠনগুলোর মধ্যে পারস্পরিক সংঘর্ষ বাধে, সেটা আদর্শের দরুন নয়, লুটপাটের ভাগবাটোয়ারা নিয়েই মূলত। কোথাও কোথাও ৬০:৪০ ভাগাভাগির বন্দোবস্ত রয়েছে, সেখানে অবস্থাটা শান্ত। জাতীয় সংসদের সদস্যরাও যদি এমন একটা ব্যবস্থায় আসতে পারতেন তাহলে তাদের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাটা কার্যকর হতো, এবং দেশে স্বস্তি আসতো। সেটা করা যায় না বলেই এতো সংঘর্ষ ও অশান্তি। যাঁরা সরকার পক্ষের তাঁরা ৬০ শতাংশ পেয়ে সন্তুষ্ট নন, আরো বেশি চান; যারা বিরোধী দলে রয়েছেন তাঁরা ভাবেন আমরা কম কিসে, ৪০ শতাংশ কেন পাবো, আরো বেশি চাই। সংখ্যাসাম্য প্রতিষ্ঠা খুবই কঠিন। কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের ভেতর চিত্তরঞ্জন দাশ সেটা করতে চেষ্টা করেছিলেন ১৯২৬ সালে, পারেননি; বাংলা ভাগ হয়েছে। পশ্চিম ও পূর্ব পাকিস্তানের মধ্যে সংখ্যাসাম্য আনতে তৎপর হয়েছিলেন হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী; সেটাও টেকেনি, পাকিস্তান ভেঙে গেছে। সুবিধা ভোগের ব্যাপারে অসাম্য থাকবে এবং বিরোধেরও অবসান হবে না। শাসক শ্রেণী এই রাজনীতিতেই লিপ্ত রয়েছে।

দুই বড় দলের কামড়াকামড়ি ইতর প্রাণীর মতো। ভাষা অশ্লীল। বক্তব্য হিংস্র। সামনে নির্বাচন আসছে। এই নির্বাচন কবে হবে, কিভাবে হবে, শান্তিপূর্ণ হবে নাকি হিংস্র, নির্বাচনের পর পরাজিত পক্ষ কি করবে এসব প্রশ্ন জরুরি; তা নিয়ে উদ্বেগও খুব স্বাভাবিক। কিন্তু ফলাফল যা-ই হোক এটা নিশ্চিত যে, সমাজে কোনো পরিবর্তন আসবে না। রাষ্ট্র তেমনি চলবে যেমন এখন চলছে। বরঞ্চ আশঙ্কা এই যে, তার চরিত্র আরো উগ্র, আরো ফ্যাসিবাদী হয়ে দাঁড়াবে। অতীতের অভিজ্ঞতা বলছে, আমাদের দেশে নির্বাচন তখনই তাৎপর্যপূর্ণ হয় যখন তার পেছনে একটা আন্দোলন থাকে। ছিচল্লিশে পাকিস্তান আন্দোলন ছিল, যার ফলে নির্বাচনের ভেতর দিয়ে নতুন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হলো। চুয়ান্নর নির্বাচনের পেছনে বায়ান্নর রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন ছিল, যার কারণে নির্বাচনে মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে গণরায় বের হয়ে এলো। সত্তরের নির্বাচনের পশ্চাদভূমিতে ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান কাজ করেছে; ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠা ঘটেছে। এখন কোনো আন্দোলন নেই, তাই নির্বাচনের ফল যে তাৎপর্যপূর্ণ হবে তেমনটা আশা করবার কারণও নেই।

দুই দলের একদল জিতবে। যারাই জিতুক রাষ্ট্রের চরিত্রে কোনো রদবদল ঘটবে না, কেননা দুই দলের মধ্যে ব্যবধান প্রধানত নামের। তারা উভয়েই চাইবে রাষ্ট্রকে যেমন আছে তেমনি রেখে নিজেদের লুণ্ঠনস্পৃহাকে চরিতার্থ করতে। দ্বিদলীয় ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা দেখে যারা উৎফুল্ল হবে তারা এই লুণ্ঠন প্রক্রিয়ার সমর্থনই করেন, অন্য কিছু না-করে। দ্বিদলীয় ব্যবস্থা ব্রিটিশ আমলে ছিল, ছিল কংগ্রেস ও লীগ; পাকিস্তান আমলেও তা দেখেছি। ছিল মুসলিম লীগ ও আওয়ামী লীগ; এ যুগেও তা দেখা যাচ্ছে। আছে আওয়ামী লীগ ও বিএনপি। তাদের মধ্যে বিরোধ বড় প্রবল, তারা মনে করে আদর্শের জন্য লড়ছে। কিন্তু আদর্শ যা তা হলো জনগণের ওপর নিপীড়নকারী বিদ্যমান ব্যবস্থাকে চালু রেখে নিজেদের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করা। যে-ই জিতুক সাধারণ মানুষের কোনো লাভ হবে না। কেননা দুই দলের কোনোটাই জনগণের পক্ষের রাজনৈতিক শক্তি নয়। পক্ষের তো নয়ই, আসলে শত্রুপক্ষেরই। নির্বাচনে জনগণের পরাজয় অবধারিত।

২.

কয়েকটি ঘটনা লক্ষ্য করলে বাংলাদেশে বিদ্যমান রাজনীতির স্বভাবচরিত্রটা বোঝা বেশ সহজ হয়। যেমন, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আবশ্যকতা, দেশের গ্যাস ও তেল বিদে--শীদের হাতে তুলে দেয়া এবং হুসেইন মুহম্মদ এরশাদকে নিয়ে টানাটানি। তত্ত্বাবধায়ক সরকার একটি অভূতপূর্ব ব্যাপার। পৃথিবীর কোনো দেশে এমন ব্যবস্থা অদ্যাবধি সংবিধানে লিপিবদ্ধ হয়নি, আমাদের সংবিধানে হয়েছে। শোনা যায়, কোনো কোনো রাষ্ট্র নাকি এর অনুকরণ করবে, করলে বোঝা যাবে তাদের রাজনৈতিক দুর্দশাটা কোন পর্যায়ে নেমেছে। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অন্তর্গত দর্শনটা কি? সেটা এই যে বড় দুই দল স্বীকার করে নিচ্ছে যে তারা একটি

নির্বাচন পরিচালনা করবে এমন যোগ্যতা রাখে না। যাদেরকে একটি নির্বাচনের দায়িত্ব দিয়ে বিশ্বাস করবার উপায় নেই, তারাই আবার দাবি করবে যে তাদেরকে রাষ্ট্র ক্ষমতা ছেড়ে দিতে হবে। আর ঐ যে বিশ্বাস করা যাবে না তা জনগণ বলছে না, বলছে ঐ দল দু'টিই। নিজেরাই। তারা ঘোষণা দিয়েছে যে, তারা মোটেই নির্ভরযোগ্য নয়, তাদেরকে নির্বাচন অনুষ্ঠানের দায়িত্ব দেওয়াটা ভুল হবে। যদি তাই হয়, নির্বাচনের ভার দিয়ে যদি বিশ্বাস রাখা না যায়, তাহলে তাদেরকে দেশবাসীর জানমালের দায়িত্ব দিয়ে নিশ্চিত হবো কোন যুক্তিতে? আসলে নিশ্চিত হবার কোনো কারণই নেই। আর কারণ যে নেই সেটা তো তারা নিজেরাই বলে দিচ্ছে, তারা তো স্ব-ঘোষিত লুণ্ঠনকারী। তাহলে? তাহলে জনসাধারণ তাদের ওপর আস্থা রাখছে কেন, কোন যুক্তিতে? না, আস্থা তারা রাখছে না। মোটেই না। তারা তাদেরকে ভোট দিচ্ছে নিতান্ত বাধ্য হয়ে। কেননা, কোনো বিকল্পের সন্ধান এখনো পাওয়া যায়নি।

বাংলাদেশে গ্যাস ও তেলের সন্ধান পাওয়া গেছে। বিদেশীরা চাইছে এ ক্ষেত্রে তারা পুঁজি বিনিয়োগ করবে। এই নতুন সম্পদ বহুজাতিক কোম্পানিকে ডেকে আনবে, ঠিক তেমনিভাবে যেমনভাবে বাংলার তাঁত শিল্প একদিন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে ডেকে এনেছিল। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি স্থানীয় সহযোগী পেয়েছিল, তারা ছিল ব্যবসায়ী ও বেনিয়া। আড়াইশ' বছর পরে নতুন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এসে হাজির হয়েছে এবং সহযোগীও পেয়ে যাচ্ছে, তফাৎ এই যে নতুন সহযোগীরা হচ্ছে শাসক শ্রেণী। সেদিনকার মীরজাফর ছিল একটি ব্যতিক্রম, এখন ঐ ব্যতিক্রমটিই নিয়মে পরিণত হয়েছে। বিদেশীদের চোখ পড়েছে চট্টগ্রাম বন্দর এবং সারা দেশের বিদ্যুৎ ও টেলিযোগাযোগের ওপর। সেখানেও বিদেশী লগ্নি পুঁজি আসবে, তাদেরকে ডাকাডাকি করা হচ্ছে। দুই বাহু বাড়িয়ে। ডাকছে দেশের শাসক শ্রেণী, যারা দুই দলে বিভক্ত, এবং ডাকাডাকিতে পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী। দেশপ্রেম কোথায়?

এরশাদ ছিলেন ধিকৃত স্বৈরশাসক। দেশের তিনি স্থায়ী ক্ষতি সাধন করে গেছেন। তাঁকে বিশ্ববেহায়া বলা হয়েছিল, সে নামকরণ যে কতটা সঠিক ছিল তার প্রমাণ তিনি তার শাসনামলে দিয়েছেন, এখনও সমানে দিয়ে যাচ্ছেন। কবিযশ প্রার্থনাসহ বিভিন্ন প্রকার লোলুপতায় তিনি পারঙ্গমতার ইতিহাসসিদ্ধ নজির স্থাপন করে রেখে গেছেন। একটি গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে তার পতন ঘটেছে। পতনকালে জনতা তাকে হাতের কাছে পেলে তার কী দশা হতো সে-কল্পনা সুখকর নয়। কিন্তু তিনি যে রাজনীতিতে আবার ফিরে এসেছেন, কেবল ফিরে আসেননি দুই দলই যেভাবে তাকে নিয়ে টানাটানি করছে তাতে বড় উজ্জ্বল হয়ে ধরা পড়ে এই সত্য যে, হায়াজ্ঞান ঐ দল দু'টির কোনোটিরই নেই। বন্ধু দিয়ে লোক চেনার পদ্ধতিটা ভ্রান্ত নয়। কে বেশি বেহায়া কে বলবে?

আরো একটি ঘটনার উল্লেখ করা যায়। কুষ্টিয়া শহরের কাছেই দেউ-ড়িয়াতে লালন ফকিরের সমাধি রয়েছে। সেটি বাউল সম্প্রদায়ের একটি আশ্রয় স্থান, সাধন-ভজন ও উৎসবের কেন্দ্র। ঐ সমাধির বুকের ওপর উন্নয়নের নাম করে ভবন ও প্রেক্ষাগৃহ নির্মাণের অতিনিষ্ঠুর তৎপরতা চলছে। সরকারি অর্থে সরকারি দলের তত্ত্বাবধানে এই অভিশ্বাস্য ধ্বংসকাজ অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এই সরকার নিজেকে বাঙালি জাতীয়তাবাদের একনিষ্ঠ সমর্থক বলে দাবি করে, অথচ বাঙালি সংস্কৃতির অত্যন্ত মূল্যবান একটি উপাদান ও ঐতিহ্য ধ্বংসের কাজ তাদের প্রশ্রয়েই ঘটে যাচ্ছে। বিরোধী দলও এ বিষয়ে কিছু বলছে না। যাতে বোঝা যায় বাঙালি জাতীয়তাবাদী এবং বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদী— এই দুই দলের ঝগড়াটা এখানে নেই, ঝগড়া রয়েছে কেবল লুণ্ঠনের সুযোগ ভাগাভাগিতে।

দেউড়িয়াতে লালনের সমাধি ধ্বংসে ঠিকাদার ও দখলদার উভয় প্রকার স্বার্থ রয়েছে। ঠিকাদার-দখলদাররা আবার ক্ষমতাসীন দলের সমর্থকও বটে, যে জন্য তারা অমন তেজীয়ান ও আগুয়ান। কিন্তু অদৃশ্যে কাজ করছে একটি পুঁজিবাদী প্রক্রিয়া। এই লোকগুলো সেই প্রক্রিয়ার হাতের পুতুল। প্রক্রিয়াটির নাম বিশ্বায়ন। বিশ্বায়ন পৃথিবীকে বৈচিত্র্যের দিক থেকে ছোট এবং নৈতিকতার দিক থেকে খাটো করে দেবে এবং দিচ্ছেও। পুঁজিবাদী বিশ্বায়ন বিশ্বকে একটি অভিন্ন বাজারে পরিণত করবে, সেখানে কোনো বৈচিত্র্য থাকবে না, স্থানীয় সংস্কৃতির বালাই বলে কোনো কিছুর অস্তিত্ব রইবে না। যেমন ইংরেজি ভাষা সারা পৃথিবীকে গ্রাস করে নিতে চাইছে তেমনি মার্কিনী সংস্কৃতি তার ভোগবাদিতা ও বাণিজ্যকে প্রতিষ্ঠিত করবে বিশ্বজুড়ে। নৈতিক ভাবে মানুষ কেবল নিজের সুখ খুঁজবে, অন্য কিছু ভাববে না। পুঁজিবাদের ঐ কুঠার লালন ফকিরকে আঘাত করছে। আমাদের জাতীয় সঙ্গীত বাউল সঙ্গীতের সুরে রচিত; কথা রবীন্দ্রনাথের, সুর গগনহরকরার; সেই সুরের উৎসকে অবলুপ্ত করে দেয়া জাতীয় সঙ্গীতের প্রতি সম্মান দেখানোর ঘোষিত অঙ্গীকারের সঙ্গে কতটা সঙ্গতিপূর্ণ তা খেয়াল না-করাকে মূঢ়তা ভিন্ন আর কি বলা যায়?

> দুই বড় দলের কামড়াকামড়ি ইতর প্রাণীর মতো। ভাষা অশ্লীল। বক্তব্য হিংস্র। সামনে নির্বাচন আসছে। এই নির্বাচন কবে হবে, কিভাবে হবে, শান্তিপূর্ণ হবে নাকি হিংস্র, নির্বাচনের পর পরাজিত পক্ষ কি করবে এসব প্রশ্ন জরুরি; তা নিয়ে উদ্বেগও খুব স্বাভাবিক

বাংলাদেশে সামাজিক সম্পত্তি আজ বড়ই বিপন্ন। সরকারি শক্তির আনুকূল্যে খাল বিল নদী উদ্যান সবকিছু দখল হয়ে যাচ্ছে। ছেউড়িয়াতে লালনের আখড়াও ঐ তালিকায় পড়ে গেছে। চোখ পড়েছে দস্যুদের, বাঁচার উপায় কি? পুঁজিবাদের কুঠার পরিবেশ ধ্বংস করছে, গাছপালা বনবাদাড় নিশ্চিহ্ন করে ছাড়বে। কুষ্টিয়াতেও সেই একই ধ্বংসলীলা দেখতে পাচ্ছি। এবং তা ঘটছে মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষের শক্তির কর্তৃত্বাধীনে। সপক্ষে যে তা চিনবো কি করে?

লালনের আখড়া ধ্বংসের এই তৎপরতা মৌলবাদীরাও করতে পারতো। অতীতে তারা করেছেও বটে। লালনের সমাধিতে প্রথম হস্তক্ষেপ ঘটে মোনেম খাঁ'র আমলে। সেই হস্তক্ষেপের ধারাবাহিকতাই তো দেখতে পাচ্ছি অব্যাহত রয়েছে। মোনেম খাঁ মৌলবাদী ছিল, কিন্তু এখন যারা অন্য ছদ্মবেশে ঐ একই কাজ করছে তাদেরকে কোন নামে ডাকি? বর্তমান সরকারের আমলে আরো একটি অমানবিক কাজ ঘটতে যাচ্ছে, সেটি হলো মৌলবী-বাজারে ইকো পার্ক তৈরি করবার নাম করে আদিবাসী গারো ও খাসিয়াদের উচ্ছেদ সাধন। এ কাজ নিঃসন্দেহে ফ্যাসিবাদী। ক্ষুদ্র জাতি সত্তার ওপর আক্রমণ করে সরকার আমাদেরকে সেই আসামির কাঠগড়াতেই দাঁড় করিয়ে দিচ্ছে, যে কাঠগড়ায় বাঙালি-বিদ্বেষী পাকিস্তানি শাসকদেরকে আমরা একদা দাঁড় করিয়েছিলাম। বাংলাদেশের রাষ্ট্র যদি ক্ষুদ্র জাতিসত্তাগুলোর ওপর নিপীড়ন চালায়, তবে এ রাষ্ট্র যে ফ্যাসিবাদী তার আরো একটি প্রমাণ সে নিজেই হাজির করবে, নিজের হাতে লিখে।

বাংলাদেশে মৌলবাদ বিকশিত হচ্ছে। মৌলবাদী আকাশ থেকে নামেনি, ভূমিতেই

উৎপাদিত হচ্ছে। মৌলবাদ হলো পুঁজিবাদের উপহার। পুঁজিবাদ বৈষম্য, দারিদ্র্য, অশিক্ষা, কুশিক্ষা সৃষ্টি করে মৌলবাদকে সমাজে উৎসাহ দিয়ে চলেছে। বঞ্চিত মনুষের বিক্ষোভ বাম দিকে প্রকাশের পথ না পেয়ে ডান দিকে চলে যাচ্ছে, ধর্মকে আশ্রয় করছে। বাংলাদেশে ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহার বিএনপি তো করছেই, আওয়ামী লীগও করছে। মাদ্রাসা শিক্ষার প্রসার দরিদ্র মানুষকে দরিদ্র রাখার একটি ষড়যন্ত্র বিশেষ। সেই ষড়যন্ত্রে কোনো দলই কম উৎসাহী নয়। এরশাদ সাহেবকে ধার্মিক বলা সহজ নয়, কিন্তু তিনি রাষ্ট্রীয় প্রবর্তনে অসামান্য উৎসাহ দেখিয়ে গেছেন। তার সঙ্গে জামায়াতে ইসলামীসহ অন্য দলগুলোর তফাৎ পরিমাণগত ঠিকই, তবে গুণগত নয়।

৩.

রাজনীতিতে ব্যবসা ঢুকে গেছে এ কথা সবাই বলছেন, কিন্তু রাজনীতি থেকে কি সরে গেছে সেটাও লক্ষ্য করা দরকার। সরে গেছে আদর্শবাদ। আমাদের দেশে অতীতে রাজনীতির মধ্যে ভালো যে জিনিসটা ছিল সে ঐ আদর্শবাদ। মূল রাজনীতিকদের প্রায় সকলেই যে পুঁজিবাদী আদর্শের নীরব অনুসারী ছিলেন সেটা ঠিক, তাঁরা সমাজবিপ্লবী ছিলেন না অবশ্যই; তবুও রাষ্ট্রের সঙ্গে তাঁদের একটা বিরোধ ছিল, আর সেই বিরোধের জায়গা-টাতেই একটা আদর্শবাদ কাজ করতো। ব্রিটিশকে তাড়াতে হবে, পাকিস্তানিদেরকে শায়েস্তা করতে হবে জাতীয়তাবাদীরা এসব লক্ষ্যে অনুপ্রাণিত ছিলেন। পাশাপাশি সমাজতন্ত্রীরাও ছিলেন তাঁদের ক্ষেত্রে আদর্শবাদী। ছিল সমাজ পরিবর্তনের, বলা যায় সমাজ বিপ্লবের। বাংলাদেশে এখন আদর্শবাদ আর কার্যকর নয়। বড় বড় রাজ-নীতিকরা রাষ্ট্রকে এখন আর বদল করতে চান না, তাকে ব্যবহার করতে চান। জাতীয়-তাবাদীদের জন্য এটাই স্বাভাবিক। তাদের জন্য রাষ্ট্র এখন মোটেই বৈরী প্রতিষ্ঠান নয়; রাষ্ট্র তাদেরকে কারাগারে পাঠাতে মোটেই আগ্রহী নয়, তবে তারা নিজেদের ভেতর-কার কলহের কারণে একে অপরকে কারাগারে পাঠা-বার চেষ্টা করেন, মামলায় ফেলেন, বিশেষ করে দুর্নীতির মামলায়। অপরপক্ষ আবার হুমকি দেয়, আমরা ক্ষমতায় যাই একবার, তোমাদেরকে দেখে নেবো, জেলের ভাত খাওয়াবো। সেটা তাদের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব রাষ্ট্রের সঙ্গে তাদের কোনো দ্বন্দ্ব নেই। রাষ্ট্র তাদেরকে সুযোগ দেয় লুণ্ঠনের, পতাকা দেয় গৌরবের। রাষ্ট্রের সঙ্গে দ্বন্দ্ব আছে জনসাধারণের, রাষ্ট্রের হাতে প্রতিনিয়ত যারা অপমানিত লাঞ্ছিত নিপীড়িত হচ্ছে, বলা বাহুল্য, আমরা অধিকাংশই এই দলে পড়ি।

ইতিহাসের কাছে আমাদের ঋণ দিনে দিনে বর্ষে বর্ষে বাড়ছে। এই ব্যবস্থাকে মেনে নেয়া মানে এর কাছে আত্মসমর্পণ করা। নত হয়ে থাকা। নত হয়ে থাকার অর্থ হলো অবস্থাকে আরো খারাপ হতে দেয়া। প্রশ্ন হলো, আমরা কি সেটা হতে দেবো, নাকি আমরা রুখে দাঁড়াবো উঠে দাঁড়াবার লক্ষ্যে? যদি পারি তবে সেটাই হবে আমাদের আদর্শবাদ। ঐ আদর্শবাদ সমাজতন্ত্রীদের মধ্যে এক সময়ে বেশ প্রবল ছিল। এখন অনেক সমাজতন্ত্রীর মধ্যে সেটা তেমন নেই। তার কারণ বিশ্বে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় একটা ধস নেমেছে। তা নামুক, সে জন্য পুঁজিবাদ যে ভালো হয়ে গেছে তাতো নয়। পুঁজিবাদ যে কত খারাপ সেটা সাবেক সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের জনসাধারণ এখন মর্মে মর্মে অনুধাবন করছে। পুঁজিবাদের বিকল্প আরো বেশি পুঁজিবাদ হতে পারে না; সামন্তবাদে প্রত্যাবর্তনও নয়, মৌলবাদীরা সে প্রত্যাবর্তনের পক্ষে বলে। পুঁজিবাদের বিকল্প হলো অধিকতর অগ্রসর এক সমাজ গড়া, যেখানে শিল্পায়নের অর্জনগুলো থাকবে, কিন্তু তারা মানুষকে দাসে পরিণত করবে না, মানুষ হবে প্রকৃত অর্থে স্বাধীন, কেননা তাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কটা হবে মৈত্রীর। লুণ্ঠন করবে না, একে অপরকে সাহায্য করবে মুক্ত হতে, অগ্রসর হতে। প্রকৃতির সঙ্গেও সম্পর্কটা হবে বন্ধুত্বের।

দেনা বাড়ছে, এখন আন্দোলন গড়ে তোলা চাই, চাই আদর্শবাদী রাজনীতিক ধারাকে ব্যাপক গভীর ও বেগবান করা। সে কাজ একা কেউ করতে পারবে না। ঐক্যবদ্ধ হতে হবে, এ ঐক্য হবে সমাজ পরিবর্তনকারীদের

বাংলাদেশে সমাজ-তন্ত্রীদের অনেকে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়েছেন সোভিয়েট ইউনিয়নের পতন দেখে, কেউ দুর্বল হয়ে পড়েছেন চীনও একই পথে যাচ্ছে দেখে। এমন ঘটনা অন্য দেশে ঘটেছে বলে শুনিনি। ভারতেও নয়। বোঝা যায় সমাজতন্ত্রকে এঁরা বৈজ্ঞানিক সত্য বলে জানতেন না, একটি রোমান্টিক কল্পলোক হিসাবেই ধরে নিয়েছিলেন। সর্বোপরি ছিল মস্কো ও বেইজিং-এর ওপর মধ্যবিত্ত পরগাছাসুলভ নির্ভরতা। সমাজতন্ত্রীরাই পারেন আদর্শবিহীন লুটপাটের রাজনীতির বিকল্প রাজনীতি গড়ে তুলতে। জনগণের পক্ষের শক্তি তাঁরাই। কেননা এই অন্যায় ও অমানবিক সমাজে পরিবর্তন আনার কথা তাঁদের ভাববার কথা, মতলবি রাজনীতিকদের নয়। সমাজতন্ত্রীরা ১১ দল গড়ে তুলেছেন। কিন্তু জোর পাচ্ছেন না। না-পাবার কারণ হচ্ছে এই যে, তাঁদের অঙ্গীকার নির্বাচনের অভিমুখে অগ্রসর হবার। তাদের হবার কথা আসলে আন্দোলন অভিমুখী। নির্বাচনে যদি অংশ নেন নিতে হবে আন্দোলনের অংশ হিসাবে, আন্দোলনকে এগিয়ে নেবার লক্ষ্যে। সে আন্দোলন হবে সমাজ পরিবর্তনের প্রয়োজনে বর্তমান রাষ্ট্রকে ভেঙে ফেলে নতুন রাষ্ট্র গড়ে তোলা। কাজটা নৈরাজ্যবাদীদের মতো হবে না, অবশ্যই, হবে সৃষ্টিকারীদের মতো। ১১ দলে এমন দলও আছে যার নেতাদের কেউ কেউ পুঁজিবাদের তো বটেই, সাম্রাজ্যবাদেরও অনুরাগী। বিল ক্লিনটন এলে এঁরা খুশি হন, গ্যাস ও তেল বিদেশীদের হাতে তুলে দিতে এরা জাতীয়তাবাদীদের মতোই আগ্রহী। এরা আসলে পুঁজিবাদীদের মতোই ক্ষমতালিপ্সু, বড় দলে জায়গা না পেয়ে ছোট দল গড়েছেন। সমাজতন্ত্রীদের পক্ষে প্রয়োজন হবে নিজস্ব জোট গড়ে তোলা। লেজুড় হবার লোভ তাদের অনেকের মধ্যে আগে দেখা গেছে; এখন সাহস করে নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে; মুরব্বির প্রয়োজন নেই, প্রভুর তো অবশ্যই নয়।

দেনা বাড়ছে, এখন আন্দোলন গড়ে তোলা চাই, চাই আদর্শবাদী রাজনীতিক ধারাকে ব্যাপক গভীর ও বেগবান করা। সে কাজ একা কেউ করতে পারবে না। ঐক্যবদ্ধ হতে হবে, এ ঐক্য হবে সমাজ পরিবর্তন-কারীদের। এতে বুদ্ধিজীবীদের একটা বড় ভূমিকা থাকবে, অতীতে যে ভূমিকাটা যাঁরা পালন করতে পারেননি, এখনও পারছেন না, সুবিধাবাদী লেজুড়বৃত্তির কারণে। খালিহাতে এলে চলবে না, আদর্শবাদ নিয়ে আসতে হবে। বুদ্ধিজীবী বলতে বিশেষ গোষ্ঠীর কথা বলছি না, বোঝাচ্ছি বিপুল সংখ্যক সচেতন মানুষকে যারা পৃথিবীটাকে বুদ্ধি দিয়ে গেছেন এবং পরিবর্তনের প্রয়োজনটাকে বৃদ্ধি ও হৃদয় উভয় শক্তিকে প্রয়োগ করে উপলব্ধি করেন। ইতিহাস মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করে এটা যেমন সত্য, তেমনি এটাও তো অবশ্যই সত্য যে, মানুষই ইতিহাসের নির্মাতা।